তৃণমূলের রাজত্বে

রক্তাক্ত গণতন্ত্র

ফয়দা বিজেপি-র

লুঠের জন্য গণতন্ত্র খুন তৃণমূলের
ফয়দা সাম্প্রদায়িক শক্তির

প্রথমে ওরা কমিউনিস্টদের মেরেছে। সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। হাজারও মিথ্যা অভিযোগে জেলবন্দী করেছে। ওরা বামপন্থীদের রক্ত ঝরিয়েছে, খুন করেছে। তান্ডব চালিয়েছে বামপন্থীদের ঘরে, পরিবারে।

তারপর ওরা অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিক্ষকদের মেরেছে। হেনস্থা করেছে নানাভাবে।

তারপর প্রতিবাদীদের মেরেছে ওরা। যে কোনও প্রতিবাদ, যেই করুন – তাঁদের সমূলে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। সেই প্রতিবাদ সোস্যাল মিডিয়ায় হোক কিংবা রাস্তায় – ওরা সহ্য করেনি। মহিলা, বৃদ্ধ, যুবক – কাউকে রেয়াত করেনি ওরা।

ওরা এক নৃশংস ব্যবস্থা কায়েম করেছে। যেখানে লক্ষ্য লুট, দেদার চুরি এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা – প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতাহীন। দেশের মধ্যে মুক্তমন, মুক্তচিন্তার ধারক, গণতন্ত্রের অগ্রণী পরিসর বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গকে ওরা এক অন্ধকারময় একদলীয় শাসনের নির্বিচার শ্বাপদভূমিতে পরিণত করেছে। ওরা ধ্বংস করেছে আমাদের সব ঐতিহ্য।

ওরা তৃণমূল কংগ্রেস। ওরা মমতা ব্যানার্জির দল। ওরা সেই জঘন্য বাহিনী – যাদের তৈরি পথে পা ফেলে, স্বাধীনতার পরে এই প্রথমবার আমার শস্য শ্যামলা জন্মভূমিতে মাথা তুলেছে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক, ঘৃণ্য, বিশ্বাসঘাতক আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি।

লড়াই তাই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

দশ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজের সর্বস্তরে গণতন্ত্র ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই এই পথে এগিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। এর প্রভাব হয়েছে মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী। এই ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরায় বিজেপি-শাসনের অনেক মিল।

রাজ্যে গণতন্ত্র যত আক্রান্ত, বিধ্বস্ত হয়েছে, যত গণতান্ত্রিক পথে প্রতিবাদের পথ রক্তাক্ত হয়েছে আন্দোলনকারীদের রক্তে, তত দুটি শক্তির দারুন লাভ হয়েছে। প্রথমত, দুষ্কৃতীদের। চোর, লুঠেরাদের। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক শক্তির। এখন দেখা যাচ্ছে সেই দুষ্কৃতী, চোর, লুঠেরারাই দল বদলের উদ্যোগ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিতে গিয়ে জুড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসেরই নেতারা – যারা রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ভূমিকা পালন করেছেন বিভিন্ন জায়গায়।

কিভাবে রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস করে সাম্প্রদায়িক শক্তির পথ প্রশস্ত করেছেন মমতা ব্যানার্জি?

১) স্বৈরতন্ত্রের আধার দলটি

কথা বলার অধিকার শুধু একজনের। বাকিরা নেহাতই শ্রোতা। নির্দেশ দেওয়ার মালিক আগে ছিলেন একজনই, ইদানিং দেড়জন। বাকিরা নেহাতই আজ্ঞাবহ। আগে ছিল শুধুই একজনের জন্য পোষ্ট, এখন সিংহাসন হয়েছে দেড়জনের – পিসি আর ভাইপোর। বাকিরা সবাই গুরুত্বহীন, ল্যাম্পপোষ্ট। 'গণতন্ত্রের প্রবেশ নিষেধ' – অদৃশ্য এই প্রবল নিয়মাবলী সাঁটানো আছে দলের প্রবেশদ্বারে জন্মলগ্ন থেকে।

তৃণমূল কংগ্রেস বলতে এটাই বোঝায়।

মূলত ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এটি। তৃণমূল কংগ্রেসে কথা বলা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে শুধু একজনেরই – তিনি মমতা ব্যানার্জি। একদল, একনেত্রী, এক কণ্ঠস্বর। ইদানিং তাঁর ভাইপো কিছু অধিকার ভোগ করছেন। এছাড়া

আর কারও কোনও অধিকার নেই। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস মূলত একটি ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের দল। এই স্বৈরতান্ত্রিক দলের সমাজে সবার মতামত নিয়ে চলতে আদৌ রাজি নয়। কারও বিরোধিতা সহ্য করে না মমতা ব্যানার্জির দল। যে কোনও বিষয়ে গায়ের জোরে দখল করাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুষ্কৃতীদের ভাষা আমদানি করেছে এই দলটিই। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির কারনে প্রথম থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস দুষ্কৃতীদের অত্যন্ত পছন্দের আশ্রয়স্থল। গত দশ বছরে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

দলে একজনই সব। সেই দলের শাসনে স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসই সব। গ্রামে, শহরে – কোথাও কেউ বিরোধিতা করলেই মারধর, বাড়িতে হাঙ্গামা করাই তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের নিয়মে দাঁড়িয়েছে। কেউ কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে না–এমনটাই দস্তুর। অন্যথায় হামলা, হুমকি, হয়রানি, মিথ্যা অভিযোগে মামলা তো অবধারিত। এমনকি খুন হয়ে যাওয়াও আশঙ্কা নয়, বাস্তব।

দলের মধ্যেও ক্ষমতাপ্রিয় নেতারা অপর সহকর্মীদের বিশ্বাস করেন না। তার থেকে এসেছে নিরন্তর গোষ্ঠীসংঘর্ষ। গত দশ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক গোষ্ঠীর গুলি, বোমা, কোপানোর শিকার হয়েছেন অনেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। প্রায় ৪০০ জন খুন হয়েছেন এই গোষ্ঠী সংঘর্ষে।

দলীয় অনুশাসনই মমতা ব্যানার্জির শাসনে চেপে বসানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে। দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্বৈরতন্ত্র বিরোধিতা মানে না, ভিন্ন মত মানে না, সমাজে কোনও অংশের স্বাধীন অস্তিত্ব মানে না। দখল তার একমাত্র দাবি। তাই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ – মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর পারিষদদের দখলের এলাকা হয়ে উঠেছে রাজ্য।

২) বিরোধিতা নিকেশ করো: তৃণমূলের পথ

'বদলা নয়, বদল চাই' – সে ছিল ২০১১'র বিধানসভা নির্বাচনের আগের স্লোগান। তৃণমূল গত দশ রাজ্যে বদল এনেছে। পশ্চিমবঙ্গ মমতা-শাসনে প্রতিহিংসার ক্লেদাক্ত মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জির মুখে এই স্লোগান শুনে ২০১১'র আগে মোহিত হয়েছিলেন অনেকে। মিডিয়া প্রচার করেছিল বিপুল উদ্যমে। ২০১১'র আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি সন্ত্রাসের প্রধান অনুঘটক ছিল মমতা ব্যানার্জিরই দল – রাজ্যবাসীকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। প্রভাবিত কী কেউ হননি? হয়েছেন। কিন্তু গত দশ বছর প্রমাণ – মমতা ব্যানার্জি মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। দুষ্কৃতীনির্ভর, প্রবল স্বৈরতন্ত্র-নির্ভর একটি দল হিংসা ছাড়া থাকতে পারে না।

বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর তা নিয়ে আর মাথাব্যথা ছিল না মমতা ব্যানার্জির। কোচবিহার থেকে গোসাবা – অনেক ভাঙ্গা পার্টি অফিস, গরিবের ঘরদোর, বামফ্রন্ট কর্মী আর কোনদিন মিছিলে পা না মেলানো অনেক গ্রাম-শহরবাসীর শরীরের নির্দয় ক্ষতচিহ্ন তার সাক্ষী।

কেমন ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘৃণা জাগানোর মনোভাব?

বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল,'সিপিএম টালা পার্কের জলেও বিষ মেশাতে পারে।' বিধানসভা নির্বাচনের পরে যখন রাজ্যজুড়ে আগুন জ্বালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু বলেছিলেন,'সিপিএম সাপের বাচ্চা। সাপের মাথা যেভাবে থেঁতলে দিতে হয়, সিপিএম-কে সেভাবে শেষ করতে হবে। সিপিএম- বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।' এমন উদাহরণ অনেক। নাট্যকার, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ব্রাত্য বসু বলেছিলেন,'সিপিএম ডালকুত্তার দল।' ঠিক এইভাবেই রাজনীতিতে, সমাজে দুষ্কৃতীদের ভাষা, ঘৃণা নিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উজ্জিবিত হয়েছে দুষ্কৃতীরা। মনে রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতী পরায়ণতা আমরা দেখেছি অনেক আগে, যেদিন মমতা ব্যানার্জি ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন,'চমকাইতলায় চমকে দেবো', 'কেশপুর হবে সিপিএম'র শেষপুর'র মত ভাষা। এমন ভাষা, নৃশংসতার মনোভাব পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এরাই এনেছে।

বিধানসভার ভোটে জিতে পাশবিক হিংস্রতায় শাসক তৃণমূল হামলা শুরু করে সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্টের কর্মী ও নেতাদের উপর। রাজ্যজুড়ে এখনও পর্যন্ত সি পি আই (এম) ও বামপন্থী দলগুলির দেড় হাজারের বেশি কার্যালয় ও ঘরবাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে। বেমালুম দখল করে

নিয়েছে বহু কার্যালয়। শাসক দলের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হয়েছেন সিপিআই(এম)-র ১৬৪ জনসহ বামপন্থী দলগুলির ২১৪জন নেতা, কর্মী ও সদস্য।

২০১৫'র ২৩ শে নভেম্বরের কথা মনে পড়ে? প্রবীণ, সৎ, সবার কাছে শ্রদ্ধার মানুষ ধীরেন লেটকেময়ূরেশ্বরের ষাটপলশায় প্রকাশ্যে মেরেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। তাঁকে নগ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করে। নৃশংস সেই হামলা হয়েছিল কারন, প্রাক্তন সভাধিপতি ধীরেন লেটসহ সিপিআই(এম) তৃণমূল কংগ্রেসের অপাশাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের পরেই মিথ্যা মামলায় বন্দী করা হয়েছিল সিপিআই(এম) নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। এই সময়কালে তৃণমূল কংগ্রেসের আক্রমনের শিকার হয়েছেন দীর্ঘদিন সংসদে বামপন্থীদের দলনেতা বাসুদেব আচারিয়াও। রক্তাক্ত হয়েছেন পার্টি নেতা রামচন্দ্র ডোমসহ অনেকে।

তবে এখন শুধুমাত্র কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা নন, আক্রান্ত সব অংশের মানুষ, যুক্তিবাদী বিশিষ্টজনেরাও। এমনকি কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরাও বাদ পড়ছে না। এক সময় যাঁরা তৃণমূলের পক্ষে ছিলেন তাঁদেরও অনেকে এখন মুখ খুলে প্রতিহিংসার শিকার।

অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র একটি কার্টুন আর একজনকে পাঠিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁকে জেলে পোরে তৃণমূল কংগ্রেস। সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনটিকে উপেক্ষা করে এখনও মামলা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। রাজ্যে কৃষকদের দুরবস্থতা নিয়ে বেলপাহাড়ির সভায় প্রশ্ন তোলায় গ্রেপ্তার হন বিনপুরের শিলাদিত্য চৌধুরী। কামদুনিতে ধর্ষণের পর মমতা ব্যানার্জির সামনে প্রতিবাদ জানানোয়, মুখ্যমন্ত্রী গৃহবধূদের বলেন,'মাওবাদী'। পার্কস্ট্রীটে ধর্ষণ হয়েছে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলায় আইপিএস অফিসার দময়ন্তি সেনকে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয় গুরুত্বহীন পদে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকার বিরোধিতা করায় এই সময়কালেই প্রকাশ্যে, স্টেশনে খুন হয়ে গেছেন শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। এমন অনেক উদাহরণ আছে গত দশ বছরে।

কতদূর যেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস দখলের জন্য?

আক্রমনের শিকার হয়েছেন মহিলারাও। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে যিনি 'যুব আন্দোলনের মশাল', সেই আরাবুল ইসলাম জলের জগ ছুঁড়ে মেরেছিলেন ভাঙড়ে কলেজের মধ্যে, এক অধ্যাপিকার মুখে। কারন – তিনি কলেজের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে আরাবুলের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে চাননি। বিধানসভার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন বামফ্রন্টের বিধায়করা। বিধায়ক দেবলীনা হেমব্রমকে চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মেরেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, মন্ত্রীরা। গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জির খুলির হাড়ে চিড় ধরা পড়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী পদ জমা দিতে যাওয়া মহিলাকে ব্লক অফিসের সামনে চুলের মুঠি ধরে মেরে শাড়ি খুলে দিয়েছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর দলের কর্মীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় মেদিনীপুরে এক মহিলাকে জুতোর মালা পড়িয়ে গ্রাম ঘুরিয়ে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার 'অপরাধে' বামপন্থী সংগঠনের মহিলা নেত্রীদের বেধড়ক মারধর করেছে পুলিশ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এমন উদাহরণ অনেক। কিন্তু ২০১৪'র ১৪ই জুনের একটি ঘটনা বলতেই হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, কৃষ্ণনগরের তৎকালীন সাংসদ একটি গ্রামে বলেছিলেন,''আমার ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়ে রেপ করিয়ে দেবো।'' তার প্রধান লক্ষ্য বিরোধীদের ভয় পাইয়ে দেওয়া। আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এক নির্বাচিত প্রতিনিধির ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী, তার পুলিশ, দল কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন,''আমি কী করতে পারি? আমি কী ওকে গুলি করে দেবো?''

এই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। খুন, রক্তপাত, জিঘাংসা এই দলের প্রধান ভিত্তি।

৩) দুষ্কৃতীদের জন্য মমতার তদন্তই চূড়ান্ত

অপরাধীরা যার দলের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত, তিনিই বারবার তদন্ত, বিচারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন – তিনিই গোয়েন্দা, তিনিই ফরেন্সিক এক্সপার্ট, তিনিই বিচারক, তিনিই আইন।

অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্ব পুলিশের। বিচারের ভার আদালতের। সংবিধান সম্মত এই পথ ধরেই দেশের শাসনপ্রণালী এগোয়। কিন্তু দুষ্কৃতীরা যে দলের ভিত্তি, অপরাধ যে দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সেই দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর কাছে সংবিধানের দেখানো পন্থা তাই গুরত্বহীন। অপরাধের মাত্রা ঠিক করা, তার তদন্ত, বিচার – সবকিছুর মালিক তিনি। এই মনোভাবের পরিচয় মমতা ব্যানার্জি গত দশ বছরে বারবার দিয়েছেন।

কোনওটা 'ছোট'। কোনওটা 'সাজানো'। কোনওটা 'মাওবাদীদের' কাজ। আবার কোনও ঘটনা নেহাতই 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের' ফল। পুলিশী তদন্তের শুরু হওয়ার আগে নিজের তদন্ত 'স্যাটাসাট' শেষ করে চার্জশিট পেশ করার ধারা মমতা ব্যানার্জি গত দশ বছরে বজায় রেখেছেন।

পুলিশের স্বাধীন তদন্তের কোনও গুরুত্ব নেই। তিনি যা বলবেন সেটিই সত্য। বাকি সব ফালতু – এই হলো মমতা-শাসন।

সালকিয়ার কথাই ধরা যাক।

২০১৫র ফেব্রুয়ারিতে খুন হন অরূপ ভান্ডারী। তাঁর নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনাকে 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব'-র ফল বলে নিদান দেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু আসলে কী? মহিলাদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সালকিয়ায় ওই যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে – নিহতের বাড়ির লোক, প্রতিবেশীদের অভিযোগ ছিল এমনই। মুখ্যমন্ত্রী সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন। একইসঙ্গে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সালকিয়ায় মহিলাদের উত্যক্ত করার অভিযোগেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বলেন, ''কোন্ মহিলাদের টিস করেছে সেটাও খুঁজে দেখতে হবে, না? খুঁজে বের করতে হবে।''

সরকারের, পুলিশের তো সেটাই কাজ। যদিও মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবের পর আর নিগৃহীত হওয়া মহিলারা ভয়ে আর আদৌ অভিযোগ জানানোর জন্য থানার রাস্তা দিয়ে হাঁটার ভরসা পান না। অভিযোগ করতে গেলে নির্যাতিতার পরিবারই হুমকির মুখে পড়ছেন, হেনস্থা হচ্ছেন।

অপরাধের এমন একক ময়নাতদন্ত মমতা ব্যানার্জি প্রায় সব ক্ষেত্রেই করেছেন।

কামদুনিতে মমতা ব্যানার্জি গেছিলেন ২০১৩-র ১৭ই জুন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মৃতার বাড়ি গেছিলেন চাকরির প্রতিশ্রুতি জানাতে। তখন গ্রামবাসীরা তাঁর সঙ্গে এলাকার দুষ্কৃতী এবং পুলিসী নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে কথা বলতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, ''চোপ। সব সিপিএম, সব সিপিএম''। পরে ১৯শে জুন দত্তপুকুরের সভায় বলেছিলেন যে, কামদুনিতে সিপিআই(এম) আর মাওবাদীরা ছিল। তাঁকে খুন করার চক্রান্ত হয়েছিল। সেবার প্রতিবাদী গ্রামবাসীরা হয়েছিলেন 'সিপিএম' এবং 'মাওবাদী'।

পার্কস্ট্রীটে ধর্ষণের ঘটনার পরে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য রাজ্য সরকারের মনোভাবের পুরোদস্তুর বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে। ২০১২-র ফেব্রুয়ারির ওই ঘটনার পরে মমতা ব্যানার্জি মহাকরণে বলেছিলেন,''সাজানো ঘটনা। সরকারকে হেয়(ম্যালাইন) করার জন্য এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। সব বের হবে।'' অন্যদিকে সেদিনই কলকাতা পুলিসের তৎকালীন যুগ্ম কমিশনার(অপরাধ দমন) দময়ন্তী সেন বলেছিলেন ধর্ষণ হয়েছে। ফলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল পদ থেকে। ২০১২-র ২৫শে ফেব্রুয়ারি কাটোয়ায় চলন্ত ট্রেনে কিশোরী মেয়ের সামনে এক মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনাকে 'ছোট ঘটনা' বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। যদিও সেই ঘটনায় বীরভূমের লাভপুর থেকে দুই শাসক দলের কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল। আবার সেই মমতা ব্যানার্জিই ১৯৯৮-র মে-তে যিনি ধর্ষিতাই হননি(পরে প্রমাণিত) সেই চম্পলা সর্দারকে 'ধর্ষিতা' বলে ঘোষনা করে দিয়েছিলেন।

২০১২-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গোটা দুনিয়া দেখলো রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ দে সরকারকে টেনে হিঁচড়ে কিল, চড় লাথি মারছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। তারা কেউই কলেজের ছাত্র ছিলো না। সেই ঘটনার দু দিন পর, ৭ই জানুয়ারি প্রথম মুখ খুলে মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন,''ছোট্ট ঘটনা নিয়ে তিলকে তাল করা হচ্ছে।'' তাঁর আরও প্রতিক্রিয়া ছিল,''একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার চলছে। কুৎসা করা হচ্ছে।'' আর আক্রমণকারীদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা কী? শাসক

দলের পতাকা নিয়ে রায়গঞ্জ কলেজ দাপিয়ে সেদিন যারা ভাঙচুর চালিয়েছিল, অধ্যক্ষকে টেনে হিঁচড়ে কিল, লাথি চড় মেরেছিল তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সান্ত্বনা, ''ছোটো ছেলে সব। ভুল করে ফাঁদে পড়ে একাজ করেছে। ওদের শোধরাবার সুযোগ দেব।''

সেই ধরনের 'ছোট ছোট ছেলেরাই' তৃণমূল কংগ্রেসের নীলমণি সব।

আর আক্রান্তকে ঠিক সেদিন যে চোখে দেখেছিলেন, কামদুনি থেকে সালকিয়া – প্রায় একই মনোভাব দেখা গেছে। রায়গঞ্জের ঘটনায় সমাজ যখন আক্রান্ত অধ্যক্ষের পাশে, তখন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন,''কলেজ কর্তৃপক্ষ (পড়ুন অধ্যক্ষ) রাজনৈতিক দলের কাছে অনেক কিছুর বিনিময়ে আঁতাত করেছেন। তিনি ইমপার্শিয়াল (নিরপেক্ষ) হলে এমন ঘটনা ঘটতো না।''

২০১৩-র ৮ই আগস্ট বেলপাহাড়িতে মমতা ব্যানার্জির সভা ছিল। সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন শিলাদিত্য চৌধুরী। ফসলের দাম নিয়ে নিজের ক্ষোভ জানানোয় তাঁকে 'মাওবাদী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কত সহজে, মুহূর্তে তিনি মাওবাদীদের চিনতে পারেন জেনেছিল রাজ্য সেদিন। তারপর সেই ক্ষুদ্র কৃষকের যথারীতি জোটে নিপিড়ন।

তাঁর এই 'তদন্তকারী'-র ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও ছিল। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে গণহত্যার কথা মনে পড়াও স্বাভাবিক। ২০১০-র ২৮শে মে'র ওই গণহত্যায় ১৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন ২০০-র। তার ঠিক দু'দিন পরেই রাজ্যের ৮১টি পুরসভার নির্বাচন ছিলো। সেদিন কী বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি ?ওই বর্বরোচিত হামলায় তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সি পি আই(এম)-র হাত আছে বলে ইঙ্গিত করেন। ৩০শে মে প্রকাশিত প্রবল 'বর্তমান' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো এই ভাষায় –'' সরডিহায় জ্ঞানেশ্বরী নাশকতার পিছনে সি পি এমের হাত আছে বলে অভিযোগ করলেন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।...তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি রাজনৈতিক দল ঘটনার পর এত তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়ল কী করে ? ...মমতার অভিযোগ, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে এতজন নিরীহ যাত্রীর প্রাণহানির ঘটনা একটা গভীর ষড়যন্ত্র।''

সেই 'ষড়যন্ত্রের' সি বি আই তদন্ত করিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। চার্জশীটে মমতা ব্যানার্জির 'সাবোতোজ', 'সি পি এম-র চক্রান্ত'-র তত্বকে আমল দিতে পারেনি সি বি আই। নৃশংস সেই ঘটনার পান্ডা বলে যারা চিহ্নিত হয়েছিল, তাদের বেশ কয়েকজন ছিল পরিচিত তৃণমূলী। যেমন উমাকান্ত মাহাতো। মমতা ব্যানার্জি নিশ্চই ভুলে যাননি। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত অসিত মাহাতো এখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। এই ঘটনাসহ একাধিক নাশকতায় অভিযুক্ত ছত্রধর মাহাতো জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক করেছেন মমতা ব্যানার্জি।

এই সরকারি মদত পাওয়া দুষ্কৃতীরা হয়েছে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান হাতিয়ার। তাদের উদ্দেশ্য লুঠ। মমতা ব্যানার্জির দলের সবসময় একমাত্র লক্ষ্য যে কোনও ভাবে ভোট দখল।

৪) 'যেভাবে হোক দখল করো'

আধিপত্য কায়েম করো সবকিছুর উপর – এটি একটি দর্শন। এর পিছনে থাকে শোষণের প্রবল ইচ্ছা। থাকে ভয়ও, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা। যা জন্ম দেয় মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের, নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি প্রবল বিদ্বেষের। গত দশ বছরে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল তাঁদের সেই মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছে সর্বস্তরে দখল কায়েমের পথে।

প্রথমে ভয় দেখাও, মিথ্যা মামলা দাও। পরিবারকে হেনস্থা করো। তারপর মারো, দরকার পড়লে খুন করো। তারপর যাকে সম্ভব, তাকে টাকা দাও, দল ভাঙাও – বিরোধীশূণ্য করার এই পথেই রাজ্যে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত, পৌরসভাসহ সব নির্বাচিত সংস্থা – গত দশ বছর এই বর্বর পদ্ধতিতেই চলেছে মমতা ব্যানার্জির শাসনে।

২০১৩'র পঞ্চায়েত নির্বাচন একটি উদাহরণ। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল। বিরোধী প্রার্থীদের উপর হামলা, ব্যাপক জবরদখল সত্ত্বেও ১৩টির বেশি জেলা পরিষদে সরাসরি জয়লাভ করতে পারেনি তৃণমূল। জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদে তৃণমূল জিততে

পারেনি। একইভাবে বহু পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতেও বিরোধীদের জয় হয়েছিলো।

এই নির্বাচনে রাজ্যের মোট ৪৮৮০০টি পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে নির্বাচনের আগেই, আতঙ্ক সৃষ্টি করে ৫৩৫৬টি আসন দখল করেছিল তৃণমূল। পঞ্চায়েত সমিতির ৯২৪০টি আসনের মধ্যে ৮৭৯টি আসনেরও একই কায়দায় দখল নিয়েছিল শাসক দল। রাজ্যে ১৭টি জেলা পরিষদের মোট আসন ৮২৫টি। তার মধ্যে ১৫টি আসনও একই কায়দায় দখল করেছিল তৃণমূল। তারপরও যেগুলিতে নির্বাচন হয়েছিল, সেগুলিতে দেদার ছাপ্পা, ভোট লুঠ, বিরোধীদের মেরে বের করে দেওয়া, বুথ দখল করে পঞ্চায়েত দখল করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচ দফা নির্বাচন শেষে ফলপ্রকাশ ৩রা আগস্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''এই জয় গণতন্ত্রের জয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জয়।'' বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বুথ দখল-ছাপ্পা ভোট-ভোট লুট করেই তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ৫১শতাংশ আসনে। সতেরোটার মধ্যে তেরোটা জেলা পরিষদ দখল করে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের প্রায় অর্ধেক আসনেই তৃণমূল হেরে গিয়েছিল। তাদের জয় হয়েছিল ৫১শতাংশ আসনে। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা সাড়ে পাঁচ হাজার আসনও রয়েছে। সেগুলি বাদ দিয়ে হিসাব করলে সোজাসুজি ভোটে লড়াই করে তৃণমূল জিতেছিল মাত্র ৪৫শতাংশ আসনে। আবার এই শতাংশের হিসাবে বুথ দখল, ব্যাপক ছাপ্পা ভোট এবং গণনার সময় ভোট লুটের হিসাবও থাকছে। তবু বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল ১৫,৫৯৩টি আসনে। শতাংশের বিচারে ৩২শতাংশ। কংগ্রেস ৫৫০৬টি আসনে। শতাংশের বিচারে ১১শতাংশ।

কিন্তু তাতে কি! নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হয় নতুন খেলা। গরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য এমন সব ঘৃণ্য, হিংস্র প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয় যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শুধু নতুন নয়, শিউড়ে দেওয়ার মতন।

দল ভাঙিয়ে পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই দখলদারি শুরু হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়াটি হলো নির্বাচিত সদস্যকে প্রাণে মেরে দেওয়া। সন্ত্রাসের পর্ব পেরিয়েই যেখানে বামপন্থীরা পঞ্চায়েত গঠন করেছিল, অঙ্ক কষে সেখানে খুনও করা হয়েছে। সভাপতি হিসাবে কাজ শুরুর আগেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম গাজিকে। পাটিগণিতের অঙ্কে সংখ্যা কমিয়ে এরপর সেই সমিতি দখলও

করেছিলো শাসকদল। এর ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফারাক্কায় খুন হন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য হাসমত শেখ। সব জেলাতেই এমন ঘটনা অজস্র ঘটেছিল। এই হিংস্র পদ্ধতিটিকেই তৃণমূলী নিয়মে পরিণত করার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

জনগনের রায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েও গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি দখলের জন্য খুনের রাজনীতি শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। বামফ্রন্ট পরিচালিত হলদিয়া পৌরসভা দখল করতে প্রকাশ্যেই সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন 'নেত্রীর নির্দেশে হলদিয়া পাল্টে দেবো'। সেই শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি এখন সভায় ভাষণ দিয়ে শেখাচ্ছেন নৈতিকতা! পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হলদিয়া পৌরসভায় সন্ত্রাস চালিয়ে, কাউন্সিলারদের অপহরণ করে ১৫ মাসের মধ্যেই দখল করে নেয় তৃণমূল। এই ছবি রাজ্যের কোথায় নেই?

তৃণমূলের দখলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ রয়েছে মুর্শিদাবাদে। ২০১৩-তে অনেক চেষ্টা করেও মানুষের ভোটে মুর্শিদাবাদ জেলায় দাগ কাটতে পারেনি তৃণমূল। ভোটের নিরিখে তাদের জনভিত্তি ছিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের তুলনায় অতি সামান্য, তারা ছিলো তৃতীয় স্থানে। নির্বাচনী ফলাফলে তৃণমূল ২৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ৮টি পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছিল। আর এখন? সেই তৃণমূল এখন জেলায় ১৭৫টি পঞ্চায়েতে রাজত্ব চালাচ্ছে। গোটা জেলায় ২৬টির মধ্যে ১টি মাত্র পঞ্চায়েত সমিতি সাগরদিঘিতে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। এখন তৃণমূলের দখলে ১৮টি পঞ্চায়েত সমিতি। আর জেলা পরিষদ? মোট ৭০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল মাত্র ১টি আসনে। বাকি সবই ছিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের হাতে। এমন জেলা পরিষদেও তৃণমূল দখলদারি কায়েম করেছে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মোট ৪২ জনকে ভাঙিয়ে নিয়ে। মোট ৪৩ জনকে নিয়ে এখন মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদ তাদের হাতে। তৃণমূলের এই গোটা দখলদারির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল যার হাত ধরে, সেই মুকুল রায় এখন তাদের দলে নেই। কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল নেতা ও পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরমতো নেতা-পালোয়ানদের হাত ধরে একই 'ফরমুলা'য় এগিয়েছে তৃণমূল।

দল ভাঙিয়ে দখলদারির এই ফরমুলা বা সূত্র মালদহ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি বহু জেলাতেই হয়েছে। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনেও মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় তাদের রমরমার মধ্যেও এখানকার বেশিরভাগ বিধানসভা আসনই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের হাতে ছিল। সেই কারণেই আরও বেশি করে পঞ্চায়েত ও পৌরসভা দখলে নামে তৃণমূল। গত এক বছরের মধ্যে প্রায় বুলডোজার চালিয়ে কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেছে তারা। দলবদলের এমন আজব খেলা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছেন জেলার মানুষ।

তৃণমূল সরকারই পঞ্চায়েত আইনে পরিবর্তন করে একবার নির্বাচিত বোর্ডের বিরুদ্ধে আড়াই বছরের মধ্যে অনাস্থা আনা যাবে না বলে নতুন আইন করেছে। তা সত্ত্বেও তৃণমূল কীভাবে বোর্ড দখল করছে? বর্বরের মতো শক্তি প্রয়োগে লজ্জা না থাকায় আইন তৃণমূলের পথে কোনো বাধা নয়। তারা বিরোধী পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করছে কিংবা প্রধানকেই দল পরিবর্তন করিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে নিচ্ছে। বহু জেলায় তারা এভাবেই দখলদারি করেছে সংবিধান, আইনকে কার্যত সবকিছুতেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

দলবদল বিরোধী আইনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে কেমন মর্যাদা দেন তার নমুনা পাওয়া গেছে খোদ বিধানসভার অন্দরে। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের বিধায়কদের দশজনকে ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিলেও বেশিরভাগই পদত্যাগ করে পুণরায় নির্বাচনের পরীক্ষার মুখোমুখি হননি। আইনত তাঁদের বিধানসভার সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত। কিন্তু সদম্ভে মুখ্যমন্ত্রী অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ''আপনাদের দলের লোককে আপনারা না রাখতে পারলে আমি কী করবো! কেউ দল পরিবর্তন করতে চাইতেই পারে, সবাই কি বন্ডেড লেবার নাকি!''

'বন্ডেড লেবার' আসলে তিনিই তৈরি করার চেষ্টা করেছেন সমাজের সর্বস্তরে। দলের কর্মী থেকে সমাজকর্মী, শিল্পী, শিক্ষক – সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে দখল কায়েম করে মুক্তচিন্তা, স্বাধীন মতপ্রকাশের ধারনাকেই ভেঙে দিতে চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

৫) নির্বাচন এক প্রহসন

নির্বাচন আর হিংসার সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবি। ভোট আর লুট অঙ্গাঙ্গী। ভোটের অধিকার যদি সংবিধান মানুষকে দিয়ে থাকে, তৃণমূলের দায়িত্ব তা কেড়ে নেওয়া – বারবার গত দশ বছরে তা প্রমাণ করেছে তৃণমূল।

গত দশ বছরে রাজ্যে যে কটি নির্বাচন হয়েছে, তার প্রতিটি সাক্ষী থেকেছে মারাত্মক সন্ত্রাসের। এমনকি কলেজ ছাত্রসংসদ যে কটি বছর রেখেছিল তৃণমূলের সরকার, সেখানেও হামলা, রক্তপাত হয়েছে। নির্বাচনে হিংসাকেই প্রধান হাতিয়ার কেন করেছিল মমতা ব্যানার্জির দল? কারন, রাজ্যের প্রচুর অংশের মানুষ তাঁর বিরোধী এই কথা শুরুর দিন থেকেই বুঝেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর প্রবল প্রভাব রাজ্যে, তা বোঝানো ছিল লক্ষ্য। তাই কোনও নির্বাচনই তৃণমূল গতদশ বছরে শান্তিপূরণ হতে দেয়নি। মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নস্যাৎ করা হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনে।

মমতা ব্যানার্জির শাসনে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩-র জুলাইয়ে। দ্বিতীয়বার নির্বাচন হয় ২০১৮'র মেতে। এই নির্বাচনে প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছিলেন। প্রায় ১ হাজার আহত হয়েছিলেন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় কয়েক হাজার বামপন্থী কর্মীদের।

২০১৩'র পঞ্চায়েত নির্বাচনেই ইঙ্গিত দিয়েছিল – মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তাই ২০১৮'র নির্বাচনে সন্ত্রাস ছিল আরও প্রবল। আরও ব্যাপক। এবার নির্বাচনই করতে দিতে চায়নি মমতা ব্যানার্জি – লক্ষ্য ছিল একটিই, দখল। প্রথম থেকেই, সব জেলায়, সব পর্যায়ে দখল করো। ২০১৮'র নির্বাচনে ৯টি জেলা পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। যে জায়গায় ভোটের সুযোগ ছিল, সেখানে জেলা পরিষদের আসনগুলির ৯৪% তে মমতা ব্যানার্জির দল জিতেছিল। দেদার ছাপ্পা, ভোট লুটের নজির হয়ে উঠেছিল এই পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' এক মহিলাকে জুতোর মালা পড়িয়ে কান ধরে ওঠবস করিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা মেদিনীপুরে। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে। এ তো একটি নমুনা মাত্র। এমন ঘটেছে বহু। এছাড়াও চলে দেদার মারধর, বাড়ি ভাঙচুর। প্রার্থীই দিতে দেয়নি বিরোধীদের। যেখানে প্রার্থী পদ জমা দেওয়ার কথা, সেই ব্লক অফিস

দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সশস্ত্র বাহিনী। বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-পালোয়ান বলেছিলেন,'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।' স্বৈরতন্ত্রর পক্ষে কী নিদারুণ, নির্লজ্জ ওকালতি! খানাকুলে প্রার্থী পদ জমা দিতে গেছিলেন বামফ্রন্টের মহিলা প্রার্থীরা। তাঁদের ব্লক অফিসের বাইরে চুল ধরে মেরে, শাড়ি খুলে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস খানাকুলে।

পৌরসভার নির্বাচনগুলিতেও এই একই সন্ত্রাসের ধারা দেখা গেছে। নাগরিকদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। পুলিশী পাহারায় বুথ দখল করে ভোট দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির দলের কর্মীরা। একের পর এক পৌরসভা গায়ের জোরে দখল করেছে তারা।

এর ফল হয়েছে মারাত্মক। মানুষ এই নির্বাচিত সংস্থাগুলির উপর বিশ্বাস, ভরসা হারিয়েছে। নির্বাচিত সংস্থাগুলি গোড়া থেকেই মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে চলাকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য করে তুলেছে। মানুষ-বিচ্ছিন্ন সংস্থা স্বভাবতই হয়ে উঠেছে দুর্নীতি, বেনিয়মের আখড়া।

৬) 'পরিবর্তন'-র পঞ্চায়েত, পৌরসভা

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে পঞ্চায়েত ছিল গ্রামের সরকার। পৌরসভাগুলি হয়ে উঠেছিল নাগরিকদের সরকারের দৃষ্টান্ত। গণতন্ত্র পৌঁছেছিল তৃণমূল স্তরে। রাজ্যে এখন, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জনগনের প্রাপ্য দেওয়ার কোনও কাজ করে না। লুট, দুর্নীতি, কাটমানির জন্যই এগুলি সক্রিয়। বাকি সব নিষ্ক্রীয়। পৌরসভাগুলিরও সেই হাল। সময়মত নির্বাচন হয়নি। এখন বেশিরভাগ পৌরসভার মাথায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই বসে। কোনও নির্বাচিত পৌরবোর্ড নেই। পঞ্চায়েত, পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় আখড়া। তাদের হুমকির সামনে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের ঠুঁটো জগন্নাথের অধম করে রাখা হয়েছে। এই অবস্থা গত দশ বছরে মমতা ব্যানার্জি গড়ে তুলেছেন।

২০১১-র মে-তে সরকার গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৩তে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হয়েছিল মারাত্মক সন্ত্রাস। পঞ্চায়েত সংক্রান্ত এই সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ২৬শে মার্চ, ২০১২। প্রথম পদক্ষেপেই মমতা ব্যানার্জি বুঝিয়ে

দিলেন তাঁর পথ কোনটি। সেদিন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয় রাজ্য সরকার। যা তার আগের ৩৪ বছরে কখনো হয়নি। শুধু উত্তর ২৪ পরগণাই নয়, সেই অনাচারের শিকার হয়েছিল মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা পরিষদও।

মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে জারি করা সেদিনের নির্দেশের (১৯৫৯/পি এন/ও/১/৩বি-২/২০১২) অনুসারে, 'কার্যকরীভাবে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৩-র ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের ২১২ ধারা অনুসারে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের টাকায় পরিচালিত যাবতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা শাসক তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অর্পণ করা হলো।'

নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংস্থাকে অগ্রাহ্য করা, মানুষের মতামতকে পদদলিত করা এবং বিরোধীদের কার্যত উৎখাত করার রাজনীতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে সেদিনই।

মমতা ব্যানার্জি গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে আমলাদের দায়িত্ব দেওয়া শুরু করেন গোড়া থেকেই। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বাধ্য হন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখতে। ২০১১-র ৩০ শে নভেম্বর রমেশ লিখেছিলেন,'' সংবিধানের ২৪৩(জি) ধারা পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কতৃত্ব দিয়েছে যাতে তা স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে। এই উপলব্ধিকে মনে রেখে, ২০০৫-র এম জি রেগা আইনে পঞ্চায়েতকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'' এই প্রসঙ্গে জয়রাম রমেশের সতর্কতা –''সংবিধানের ২৪৩(জি) ধারায় নির্দিষ্ট ভূমিকা যাতে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।'' অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এসবের তোয়াক্কাই করেননি।

সেই আগ্রাসী ধারা পরবর্তীকালেও চলেছে।

৭) গর্বের পঞ্চায়েত হলো লুঠের পঞ্চায়েত

সন্ত্রাসের মাধ্যমে দখল কায়েমের লক্ষ্য একটিই – দেদার, বাধাহীন লুটের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির সিংহভাগ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এটি এখন কোনও অভিযোগ নয় শুধু। রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যা অত্যন্ত যন্ত্রণার এবং লজ্জার। প্রায় প্রতিটি সরকারী প্রকল্পের সুযোগ পেতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের 'কমিশন', 'তোলা' দিতে হয় গ্রামবাসীদের।

চুরি বন্ধ করতে গেলে কী করতে হবে? মুখ্যমন্ত্রীর মতে ''চুরি আটকাতে হবে। তাই তাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে।'' এই মানোন্নয়ন মানে কী? মমতা ব্যানার্জির মতে ''ভাতা বাড়ানো।'' ২০১৭-র ৩রা ফেব্রুয়ারি, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি এই মত বাতলেছেন। সেই মঞ্চে মমতা ব্যানার্জি পঞ্চায়েতের সদস্যরা যারা চুরি করেন, কেন করেন – তার ব্যাখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখ থেকে সেদিন শোনা যায়,''শুধু বলবে ও' চোর ও' চোর। আরে চুরি করবে না কী করবে? ওদের সুযোগ তো দাও।''

মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের প্রতিক্রিয়া শুনে অনেক পঞ্চায়েত সদস্যেরই মনে হয়, চোর-সাধুর কোনও তফাৎই নেই। পঞ্চায়েতের সদস্য মানেই চোর? মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সি পি আই(এম)-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্য মিশ্র বলেছিলেন,''যারা আমরা সবাই চোর বলে মিছিল করে, তাদের থেকে এর চেয়ে বেশি কী আশা করা যায়? আমরা সবাই চোর-চুরির সামাজিকীকরণ চাই – এটাই ওদের দাবি।''

কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন হাজির হয় পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যার পর। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পর মন্ত্রী, বিধায়কদের ভাতা অনেক বেড়েছে। তারপরও সেই মন্ত্রী, বিধায়কদের বিরুদ্ধে এত বিশাল সম্পত্তি বানানো, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারীতে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে কী করে? চুনেপুঁটি থেকে নেতা, মন্ত্রী, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় কী

করে? তাদের পরিবারের জন্য সরকারী সুযোগ আকছার লোপাট হয়ে যায় কী করে? লোকসভার মোটা বেতন পাওয়া সত্বেও অনেক সাংসদের বিরুদ্ধে চুরি, চিটফান্ডের টাকা লুটের অভিযোগ কেন উঠেছে? সারদা, নারদের মত ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে টাকা লুটের অভিযোগ উঠছে কেন? সিন্ডিকেট, ঠিকাদাররাজ, ঘুষ, তোলাবাজির রাজত্বের দাপটে গোটা রাজ্যের আনাচে কানাচে। যা তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আবার পঞ্চায়েত সদস্য মাত্রই চোর নন। ভাতা বাড়ালেই চুরি কমে যাবে, এটিও দুর্নীতি আড়াল করতে তৃণমূল কংগ্রেসের দাওয়াই এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। আসল কথা – পঞ্চায়েতকে কোন্ দল কিংবা পার্টি সামগ্রিক অর্থে কী চোখে দেখে? তাদের আদর্শ, নীতি কী? তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কী?

তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও দর্শন এবং নীতির বালাই নেই। প্রধানত ধান্দা-নির্ভর এই দলটি। ফলে সমাজের সবকটি ক্ষেত্রের মত পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে মূলত ধান্দা, টাকা কামানোর ক্ষেত্র।

একশো দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মত প্রকল্পগুলিতে দেদার চুরির নির্দশন ছড়িয়ে রাজ্যে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত দল ও নেতারাই যেখানে প্রত্যক্ষ নজির, সেখানে বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কারন – দুর্নীতি রাজ্য জুড়ে এবং ব্যাপক, পঞ্চায়েতের প্রতিটি পর্যায়ে। বার্দ্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধীদের ভাতা, আদিবাসী কিংবা তফসিলী জাতির মানুষের জন্য ভাতাসহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরে চালু পরিষেবা গ্রামবাসীদের প্রাপ্য। সেই ন্যায্য পাওনা 'পাইয়ে দেওয়ার' নাম করে কাটমানি নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, এমন উদাহরণ ভুরিভুরি। দেরিতে হলেও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সেটা পাপস্খালনের অজুহাতের জন্য হলেও স্বীকার করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সভাগুলিতে মমতা ব্যানার্জি কী বলছেন? বলছেন,''যারা বিজেপি:তে যাচ্ছে, ওরা অনেক টাকা করেছিল। কালো টাকা সাদা করতে যাচ্ছে।'' এই কথা তিনি দশ বছরে বলেননি। তাঁরই নেতৃত্বের আশ্রয়ে বসে এই বিপুল দুর্নীতি করেছে তাঁর দলের নেতারা। তাঁর পরিবারের দিকেও উঠেছে দুর্নীতির আঙুল।

পঞ্চায়েতের কাজের আগেই দশ থেকে পনেরো শতাংশ অর্থ শাসকদলের নেতার পকেটে পৌঁছে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ঠিকাদাররা। গরিবের বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প পি এম এ ওয়াই জি-র ক্ষেত্রে দুর্নীতির ছবি আরও পরিষ্কার। অভিযোগ, পাকা বাড়ির রঙ পাল্টিয়ে টাকা আত্মসাৎ করছেন তৃণমূলের নেতারা। গরিব মানুষের মাথায় আর জুটছে না পাকা ছাদ। প্রায় প্রতি পঞ্চায়েতেই এই প্রকল্পের জন্য গরিব মানুষকে দিতে হচ্ছে দশ থেকে কুড়ি হাজার টাকা। তাও আবার অগ্রিম, আবেদন মঞ্জুর হওয়ার আগেই।

৮) খুন, হামলা, রক্তপাত – ফ্যাসিবাদী কায়দা

গত দশ বছরে ২২৪জন বামপন্থী নেতা, কর্মী তৃণমূলের আক্রমনে শহীদ হয়েছেন। ঘরছাড়া হয়েছেন কয়েক হাজার। ২০১১'র ১৩ই মে মমতা ব্যানার্জি মহাকরণের কাঙ্খিত মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে পৌঁছোন। তার আগেও অনেক তৃণমূলের আক্রমনে ঘরছাড়া হয়েছিলেন। তাঁদেরও একাংশ আজও নিজের এলাকার বাইরে কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। গত দশ বছরে লাগাতার বামপন্থী নেতা, কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল।

এই হামলার কারন প্রধানত একটিই – এলাকায় এলাকায় মমতা ব্যানার্জির শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার সাহস, সাংগঠনিক দৃঢ়তা যাঁদের আছে, আগে তাঁদের উৎখাত করো। হয় তাড়াও, নাহয় খুন করো। পারলে পরিবারশুদ্ধ উপড়ে ফেলো এলাকা থেকে। এর মাধ্যমে এক প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করো – যাতে কোনও প্রতিবাদই বাঙ্ময় না হতে পারে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে ফল ঘোষণার পরবর্তী একমাসের মধ্যে সিপিআই(এম)-র ১৪ জন কর্মী শহীদ হয়েছেন। ১জনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। ধর্ষিতা হয়েছেন ১০জন। শারীরিকভাবে নিগৃহীতা বা লাঞ্ছিতা হয়েছেন ৯৩জনের বেশি। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরবর্তী একমাসে ২১৫১জন নেতা-কর্মী-সমর্থক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হয়তো সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে, এমনভাবে আঘাত করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় আক্রান্ত

হয়েছেন বামফ্রন্টের নবনির্বাচিত বিধায়করাও। হলদিয়ায় সিপিআই(এম) বিধায়িকার বাড়িতে হামলা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের পার্টি অফিস আক্রমণ, ভাঙচুর বা দখল করা হয়েছে। সি পি আই (এম)-র ৬৮৪টির বেশি পার্টি অফিস দখল, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তাছাড়া বামপন্থী গণসংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের ১৩৫টি অফিস একইভাবে দখল বা ভাঙচুর অথবা আগুন লাগানো হয়েছে।

সিপিআই(এম)সহ বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অজস্র মিথ্যা মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও মানুষের জীবনজীবিকার ওপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুবিচার ও আক্রান্তের ভরসাস্থল হওয়ার কথা পুলিস। আইনের শাসনের ভিত্তিতে কাজ করতে গেলে শাস্তি ও হুমকির মধ্যে পড়তে হয় পুলিস-প্রশাসনের কর্মী ও অফিসারদের। তাদেরও আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হচ্ছে। পুলিস, প্রশাসনিক ব্যবস্থাটাকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বশংবদ, দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। নিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে ন্যূনতম কাজ করার চেষ্টা হলে সেই অফিসারদের জায়গা হচ্ছে আস্তাকুঁড়ে। তাই পুলিসের আইনী শাসন রক্ষার মেরুদন্ড অন্তর্হিত। ফলে থানায় অভিযোগ করা হলে উলটে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে। অভিযোগকারীর বাড়িতে আবার আক্রমণ করা হচ্ছে।

বসিরহাটের পানিগোবড়া গ্রাম তৃণমূলী বর্বরতা একটি নিদর্শন হয়ে রয়েছে। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের পরে, জুন মাসে তৃণমূলী আক্রমণে জনশূণ্য হয়ে যায় পানিগোবরা গ্রাম। একের পর এক বাড়িতে সেখানে আগুন লাগিয়ে ঘরছাড়া করা হয়েছে গ্রামবাসীদের। জ্বলে গেছে গরিবের সর্বস্ব। সারারাত গ্রামের মহিলারা পাটখেতে লুকিয়ে রাত কাটিয়েছেন। শিশুদের মুখে কয়েকফোঁটা জল ছাড়া কিছু দিতে পারেননি। গ্রাম ঘিরে তাণ্ডব চালানোর পাশাপাশি তৃণমূলের বাহিনী রাস্তা অবরোধ করে পুলিস ও সাংবাদিকদের পথ আটকেছে। বসিরহাট থানার পুলিশ মার খেয়েছে। কতটা বেপরোয়া শাসক দল – বসিরহাট তার প্রমাণ। ময়ূরেশ্বরের ঢেকা অঞ্চলের বটনগর গ্রামে এক ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলার উপর হামলা চালাতেও পিছপা হয়নি তারা। আক্রান্ত পরিবারের অভিযোগ, আমরা এই নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়াতেই এই আক্রোশ।

তাই বদলা নেওয়ার জন্যই এই হামলা। মেদিনীপুরে এক চিকিৎসকের চেম্বার ভাঙচুর হয়েছে। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় কলের লাইন, বিদ্যুতের লাইন নষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। ভেঙে দিয়েছে কল। কেন? সেই সব জায়গায় বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। তাদের কর্মীদের শাসানি –''আমাদের হারিয়েছিস। যা এবার তোদের এমএলএ-কে বলে জল বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে নে।''

এমন উদাহরণ অনেক। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের এমন হামলার হিংস্র নির্দশন।

বোলপুরসহ রাজ্যের কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা দেখেছেন বাড়িতে হামলা চালানোর পর ছাত্রীর সাইকেল নিয়ে চলে গেছে লুঠেরাদের দল।২০১৫'র ঘটনা। কেন? সেই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা –''আমরা সাইকেল দিয়েছিলাম। ভোট দিসনি। সাইকেল নিয়ে গেলাম।'' এখন তৃণমূল সরকার কন্যাশ্রী আর সাইকেল বন্টনের সাফল্য নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। কিন্তু এই কন্যাশ্রী এবং সাইকেল নিয়ে তৃণমূল ভোটের আগে কীভাবে প্রচার করেছে? একেবারে ফ্যাসিবাদী কায়দাতেই হুমকি দিয়েছিলো তারা। বীরভূমে তৃণমূল নেতাদের ভোটপ্রচারে মাইকে বলতে শোনা গেছে, যে বুথ এলাকায় তৃণমূল জিতবে সেখানে আরো অনেক উন্নয়নের ঢালাও ব্যবস্থা করা হবে। আর যেখানে জিতবে না, সেখানে সবুজসাথীর সাইকেল ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হবে। রেশন কার্ড কেড়ে নেওয়া হবে ইত্যাদি। ময়ুরেশ্বরের ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ভোটের আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিলো, তৃণমূল না জিতলে সাইকেল কেড়ে নেওয়া হবে, জরিমানা আদায় করা হবে। বাস্তবে বিধানসভা ভোটের পরে তা হাতে কলমে করে দেখিয়ে দিয়েছে।

গত ২০২০'র আগস্টে গড়বেতা দেখেছে একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি কর্মীদের সমান্তরাল হামলার। উত্তরবিলে যখন পার্টিকর্মীদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই সময়েই ধাদিকায় আক্রমন চালায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। দু'দলেরই লক্ষ্য এক, চক্রান্ত এক – বামপন্থীদের কিছুতেই মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। আমফানের ক্ষতিপূরণ চাইতে গিয়ে গ্রামবাসীরা আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের হাতে – এমন ঘটনার সাক্ষী হয়েছে তমলুক।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মল্লিকপুরে সিপিআই(এম) কর্মীদের উপর সশস্ত্র তৃণমূলীরা হামলা চালিবেছে। রক্তাক্ত হয়েছেন ৩ জন মহিলাসহ ১২ জন। কুলতলিতে খুন করার চেষ্টা হয়েছে এক পার্টিনেতাকে।গ ২০২০'র জুনে নন্দীগ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের ত্রাণ দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসীদের নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন পার্টিকর্মীরা। ডায়মন্ডহারবারে, মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জির লোকসভা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে ডাকা সাধারন ধর্মঘটের প্রচার করায় আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআই(এম) কর্মীরা ২০২০'র নভেম্বরে। ফলতার মত রাজ্যের কিছু এলাকায় এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের তান্ডবে মানুষের প্রতিবাদ, বামপন্থীদের স্বাভাবিক কাজকর্মের উপর জারি আছে 'নিষেধাজ্ঞা।'

এছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকায় রেগায় কাজ বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনিতেই রাজ্যে রেগায় কাজ খুবই কম হয়। যা হয় খাতায় কলমে। টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। তাও যেটুকু কাজ হচ্ছে, সেখানে গরিবের মধ্যে বিভেদ তৈরির রাস্তা নিয়েছে শাসক দল। যাঁরা তাদের ভোট দেয়নি বলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মনে হয়েছে, তাঁদের একশো দিনের প্রকল্পে কাজ দেওয়া হচ্ছে না। কাজ চাইতে তাঁরা গেলে, শুনতে হচ্ছে –''ভোট দিসনি, কাজও পাবি না।'' নষ্ট করা হয়েছে ছোট দোকান, ফসলে আগুন দেওয়া হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে জীবিকা। একাধিক গ্রাম থেকে গরু, ছাগল, যাবতীয় আসবাব, ধান, চাল, টাকা-পয়সা লুট করে লরিতে তুলে চালান করছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। আমতার মুক্তিরচকের ধর্ষিতার পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে। বাগনান থানার শীতলপুর গ্রামে এক আশাকর্মীর শ্লীলতাহানি করেছে তৃণমূলীরা। তাঁর 'অপরাধ' ছিল বুথে সি পি আই (এম)-র এজেন্ট হয়ে বসেছিলেন। শাসক দলের খাস তালুক নন্দীগ্রামেও সব বুথে তারা জিততে পারেনি মারাত্মক একাধিপত্য কায়েম রাখা সত্বেও। তাই ফ্যাসিস্তসুলভ কায়দায় যে যে বুথে বা ওয়ার্ডে কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতে বামপন্থীরা নির্বাচনে ভালো ফল করেছে, সেখানেই এই আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। সেইসব এলাকায় যাঁরা পোলিং এজেন্ট ছিলেন অথবা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন, এমন কর্মীদের ওপর বেছে বেছে আক্রমণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত এই আক্রমণের উদ্দেশ্য একটিই। তা হলো বামফ্রন্ট কর্মীদের বা বিরোধীদের নিচুতলার কর্মীদের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন বা লোকসভা নির্বাচনের

আগে তাঁরা মাথা তুলতে না পারে। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনগুলিতে জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আত্মবিশ্বাসহীনতা মাথাচাড়া দিয়েছে শাসক দলের মধ্যে। আগামীদিনে বিরোধীদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ, অবকাশ আছে, মানুষ ক্ষুব্ধ – তা তারা বুঝতে পারছে। তাই এই লড়াইয়ের প্রধান শক্তি বামপন্থীদের এবং সাধারণভাবে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করাই তৃণমূলী সন্ত্রাসের লক্ষ্য।

৯) দলদাসে পরিণত করো

প্রথমে পুলিশের স্বাধীনভাবে কাজ করা বন্ধ করা হয়েছে। তারপর দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। এখন পুলিশের একাংশ রূপান্তরিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ক্রীতদাসে।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ছ' মাসের মধ্যে মমতা ব্যানার্জি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পুলিশের কাজ বলতে কী বোঝেন। ২০১১র ৬ নভেম্বর কলকাতায় ভবানীপুর থানায় ঢুকে পুলিশকে শাসিয়ে অপরাধমূলক কাজে আটক দলীয় কর্মীদের ছাড়িয়ে এনেছিলেন। ২০১৩সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি দিন দুপুরে গার্ডেনরিচে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মহম্মদ ইকবালের ঘনিষ্ঠ সেখ সুজানের গুলিতে নিহত হন পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরী। ২০১৪-র ৩রা জুন। বীরভূমের আউলিয়া গ্রামে বোমার আঘাতে গুরুতর জখম দুবরাজপুর থানার এস আই অমিত চক্রবর্তী। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। এমন অনেক ঘটনা আছে। ২০১৪র ১৪ই নভেম্বর। আলিপুর থানায় আলিপুরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সাহার বাহিনীর হামলা, ভাঙচুর। ভয়ে পুলিশকর্মীরা ফাইলের আড়ালে, টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়েন। যেহেতু আক্রমণকারীরা ছিল তৃণমূলের নেতা ও কর্মী। এই ঘটনা হয়ে ওঠে রাজ্যে পুলিশের দুরবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলার প্রতিক।

তারপর লাগাতার পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। পাশাপাশি চলেছে চাপ দিয়ে পুলিশকর্মীদের প্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীতে পরিণত। পুলিশ অফিসারদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে, সুযোগ সুবিধা দিয়ে বশংবদ করা হয়েছে। তেমনই একজন ছিলেন বিজেপি'র বর্তমান নেত্রী ভারতী ঘোষ। প্রকাশ্যে, সভামঞ্চে

তিনি মমতা ব্যানার্জিকে 'মা' অভিহিত করেছিলেন। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার থাকাকালীন তার মত অনুসারে চলতো তৃণমূল কংগ্রেস। সেই তার বিরুদ্ধে উঠেছিল একাধিক অভিযোগ। পরে বোঝাপড়ায় অসুবিধা হওয়ায় তিনি বিজেপি'র আশ্রয়ে চলে যান।

শিক্ষক, অধ্যাপক, অফিসার, চিকিৎসকদের একাংশকেও প্রলোভনে, ভয় দেখিয়ে বশংবদতে পরিণত করা হয়েছে গত দশ বছরে। যাঁরা তা মানতে চাননি তাদের হেনস্থা করা হয়েছে বা দূরে বদলি করা হয়েছে কিংবা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন ডা. শ্যামাপদ গড়াই। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী সপারিষদ ঢুকে পড়েছিলেন। হাসপাতালের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে বলায় তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। যাবতীয় প্রাপ্য আটকে দেওয়া হয়। পরে আদালতে সরকার হেরে যায় তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য দেয়নি।

রাজ্যের শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র শিল্পীদের জগতেও এই আঘাত এসেছে। টালিগঞ্জ চলে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীর ভাইয়ের দখলদারিতে। যারা মমতা ব্যানার্জির মঞ্চে যাবেন না, তাদের কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দমবন্ধ করা পরিবেশ সমাজের সর্বস্তরে কায়েম করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন।

১০) শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য:

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধিকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসন ছিল অধিকার। যার মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল গণতন্ত্রের পাঠশালা। ছাত্রছাত্রীরা গণতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা পেত প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলগুলি নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়েও স্বাধীন উদ্যোগ নিতে পারতো। মমতা ব্যানার্জির শাসন তা ভেঙে দিয়েছে।

২০১৫'র গত ৩০শে এপ্রিল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনে হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে বলেন, ''একশো বার স্বাধিকারে হাত দেব। মাইনেটা তো আমিই দিই।'' মানে, নিয়মনীতি নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় মর্জিই নিয়মপদ্ধতি। তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে সরে যেতে হয়েছে একের

পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে। কলেজের ছাত্র সংসদ তছনছ করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারের অপশাসন, কলেজে হাঙ্গামা, শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার পরিবেশের মত দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশী হেফাজতে শহীদ হতে হয়েছে কমরেড সুদীপ্ত গুপ্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের হামলায় শহীদ হয়েছেন সাইফউদ্দিন মোল্লা। গত সাড়ে ন' বছরে রাজ্যে শহীদ হয়েছেন ৮ জন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী। আহত হয়েছেন অনেক ছাত্রকর্মী। অনেক ছাত্র আন্দোলনের কর্মীকে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রভূত ক্ষতি হয়েছে তাঁদের শিক্ষার। টোকাটুকি, জোরজবরদস্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ঘটনা। ২০১৮'র ৩০শে জুলাই। কলেজে ভর্তির জন্য টাকা তোলার ঘটনাকে বিধানসভায় 'দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা' বলে অভিহিত করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি। এমনকি মিডিয়াকে দোষারোপ করে তারাই 'অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করেছে' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। কলেজে ভর্তির জন্য তোলাবাজির ঘটনা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার দাবি করেছিলেন বিরোধী বিধায়করা। কিন্তু সেই আলোচনার অনুমতি মেলেনি। শিক্ষামন্ত্রীকে বিরোধীরা প্রশ্ন করতে চাইলে তারও অনুমতি মেলেনি। অথচ কলেজে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে লোক দেখানোর জন্য হলেও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটে যেতে হয়েছিল তাঁর বাড়ি সংলগ্ন একটি কলেজে। পুলিশ কমিশনারকেও যেতে হয়েছিল। ওখানেই গল্প শেষ। তারপর যথারীতি চলতে থাকে তৃণমূলী রাজ। এমন পরিস্থিতি অতীতে কখনও দেখা যায়নি কলেজে ভর্তি নিয়ে।

এই অবস্থা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষতি করেছে। অধিকার হারানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যে অবিচ্ছেদ্য অংশরা প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের বলে মনে করতো, তাঁরা হতোদ্যম হয়েছে। কথা বলার, মতামত দেওয়ার সুযোগ হারিয়েছে। হারিয়েছে উৎসাহ।

১১) নিষ্ক্রিয় সংখ্যালঘু, মানবাধিকার, মহিলা কমিশন

বিভিন্ন কমিশন তৈরি করা হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে। সংখ্যালঘু কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, লোকায়ুক্ত, মহিলা কমিশন ইত্যাদি। এগুলি তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচিত সরকারকে বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে সতর্ক করা, ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেওয়া। এই স্বাধীন, স্বয়ংশাসিত কমিশনগুলি

ছিল সরকারের চোখ, কানের মত। গত দশ বছরে এগুলিকে নিষ্ক্রীয় করেছেন মমতা ব্যানার্জি। প্রতিটিকে নিজের তালুবন্দী করেছেন। ক্ষতি হয়েছে মানুষের এবং গণতন্ত্রের।

প্রতিটি জেলায় ওমবাডসম্যান থাকার কথা। একশো দিনের প্রকল্পে আর্থিক বিষয়ে নজরদারির জন্য। রাজ্যে নেই। কারন – মমতা ব্যানার্জি চাননি এমন কোনও পদ যা দলের স্বেচ্ছচার, চুরি আটকাতে পারে।

এটি একটি নমুনা মাত্র।

বামফ্রন্ট সরকার লোকায়ুক্ত গঠন করেছিল রাজ্যে। তৈরি হয়েছিল আইন। সেই আইন বদলে দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির সরকার। দিনটি ছিল ২০১৮'র ২৬ জুলাই। মমতা ব্যানার্জি কী পাশ করিয়েছিলেন? মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনার অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সেদিন তৃণমূল সরকার বিধানসভায় পেশ করেছিল লোকায়ুক্ত সংশোধনী বিল। সেদিন বিলের পক্ষে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ''আমি টোটো পার্টি নই। আমাদের নিজস্ব মতামত আছে। সেই অনুযায়ী আমরা আইন সংশোধন করে নিচ্ছি। কাল আপনাদের মেজরিটি এলে (বিধানসভায়) তখন আপনারা আইন সংশোধন করে নেবেন।''

কী দম্ভ!

কিন্তু কেন? কারণ সেদিনই ওই বিলের সাহায্যে যে কোনও দুর্নীতির অভিযোগের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন 'সততার প্রতীক' মমতা ব্যানার্জি!

এর আগে ২০০৩-এ বামফ্রন্ট সরকার লোকায়ুক্ত আইন তৈরি করেছিল। সেই আইনে মুখ্যমন্ত্রী সহ যে কোনও মন্ত্রী, বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের অধিকার দেওয়া হয়েছিল স্বাধীন লোকায়ুক্তকে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকায়ুক্তে অভিযোগ জানানোর সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেছিল বামফ্রন্ট। তাছাড়া রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রী লোকায়ুক্তের আওতায় ছিলেন। বিধায়করাও ছিলেন এর আওতায়। এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়রসহ কাউন্সিলাররা, পৌরসভাগুলির চেয়ারম্যান, ভাইস

চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতিসহ নির্বাচিত সব সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতিসহ সব নির্বাচিত সদস্য, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানসহ প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য লোকায়ুক্তের আওতায় ছিলেন। এমনকি সমবায়গুলির সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির নির্বাচিত সদস্যরাও ছিলেন এই আইনের আওতায়। কারা অভিযোগ করতে পারতেন লোকায়ুক্তে? সরাসরি রাজ্যের যে কোনও বসবাসকারী দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারতেন নির্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে। ভবানী ভবনের তিন তলায় লোকায়ুক্তের কার্যালায়ও গড়ে উঠেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই সংক্রান্ত আইনে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে লোকায়ুক্ত নিজে স্বাধীন তদন্ত করবে, রিপোর্ট পেশ করবে। লোকায়ুক্ত যে কারও কাছে কোনও অভিযোগের তদন্তে প্রমাণ পেশের নির্দেশ দিতে পারতো। তদন্তে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেলে লোকায়ুক্ত সংশ্লিষ্ট জায়গায় সেই রিপোর্ট দিতে পারতো।

বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী কিংবা বামফ্রন্টের বিধায়কদের ভয় ছিল না কোনও। কারণ, দুর্নীতি ছুঁতে পারেনি সেই '৩৪ বছর'কে। মমতা ব্যানার্জিও অনেক চেষ্টা করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির ফাইল বের করতে পারেননি– যদিও তেমনই করবেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন দশ বছর আগে।

উল্টে কী করলেন? ২০১৮'র জুলাইয়ে মমতা ব্যানার্জি বিধায়ক, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য মানুষের সেই অধিকারই কেড়ে নিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বদলে ফেলা আইনে তিনটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের তদন্ত লোকায়ুক্ত করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত লোকায়ুক্ত তবেই করতে পারবে, যদি বিধানসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তাতে সম্মতি দেয়। তৃতীয়ত, রাজ্য সরকার অনুমতি দিলে তবে বিধায়ক এবং অন্যান্য 'পাবলিক সার্ভেন্ট'দের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে।

সেদিন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের বিধায়করা এই আইন বদলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সংশোধনী জমা দেন। ভোটাভুটি হয়।

সেদিন বিজেপি'র তৎকালীন পরিষদীয় দলনেতা, দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ শুধু আলোচনায় অংশ নেন। কিন্তু বিলের বিরুদ্ধে কোনও সংশোধনী জমা দেননি, এমনকি বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের ওপরে ভোটাভুটির সময় ভোটও দেননি।

মমতা ব্যানার্জি তিনি জানতেন অন্যায় পথে দেদার টাকা কামাচ্ছিলেন তাঁর দলের অনেক বিধায়ক, মন্ত্রী। সেই টাকা কালো। তবু তিনি তা জেনেশুনে বসে থেকেছেন। তাঁদের আরও টাকা কামাতে দিয়েছেন। তাঁদের যাতে মানুষ আইনি পথে ধরতে না পারেন, চ্যালেঞ্জও না করতে পারেন, সেই রাস্তা বিধানসভায় পরিষ্কার করেছেন কে? মমতা ব্যানার্জি। আর সেদিন সেই মারাত্মক বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল কে? বিজেপি। কেন? কারণ, দলবদলের খেলা হবে– তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক সংগঠন' আরএসএসের দীর্ঘদিনের প্রচারক দিলীপ ঘোষের তা ধারণায় ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি'তে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের বড় অংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। কোন ভরসায় তারা প্রধানমন্ত্রীর দলে ভিড়ছেন? কেন তারা মনে করছেন– বিজেপি'তে গিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসের মতোই দেদার লুট করা সম্ভব?

কারণ, দুর্নীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিলমোহর লাগানোর উদ্যোগ বিজেপিতেই দেখা গেছে। অথচ মোদী বলেছিলেন, ''না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা''! মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের ৪৫ মাস পর ডাকা হয়েছে লোকপাল সদস্য নির্বাচন কমিটির বৈঠক। তাও নিষ্ক্রীয় নরেন্দ্র মোদীর জমানায়।

এটি একটি উদাহরণ। সংবিধান সম্মত এমন প্রতিটি কমিশনের কার্যকারিতা খর্ব হয়েছে মমতা ব্যানার্জির শাসনে। যেমন সংখ্যালঘু কমিশন। মহিলা কমিশন এবং সব বিক্ষধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে তৈরি মানবাধিকার কমিশন। দেশের মধ্যে প্রথম। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা সেই কমিশনের চেয়ারম্যান হতেন। নিরপেক্ষতা ছিল এই কমিশনের বৈশিষ্ট্য। কমিশন অনেক ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত করেছে। রিপোর্ট তৈরি করেছে। সুপারিশ জমা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার তার সিংহভাগ গ্রহণ করেছে। সেই অনুসারে ব্যবস্থা নিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি সরকারে এসে

কমিশনকেও কুক্ষিগত করলেন। যখন তিনি সরকারে এলেন, তখন কিছুদিন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি। গাঙ্গুলি কিছু সুপারিশ করেছিলেন সরকারের কাছে, উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। তাতে রেগে যান মমতা ব্যানার্জি। বিধানসভার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে মমতা ব্যানার্জি এই কমিশন সম্পর্কে তাঁর ধারনা স্পষ্ট করেন। ২০১৪'র ১৩ আগস্ট তিনি বলেন,''ভাবলাম একটা নিরপেক্ষ লোককে দিয়ে কাজ করাবো। এখন দেখছি কী লিখে পাঠাতে হবে তাই জানে না। এমনভাবে লিখছে যেন নিজেকে প্রেসিডেন্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনে করছে।'' শুধু তাই নয়, মানবাধিকার কমিশন ঠুঁটো হয়ে থেকে সরকারের আস্থা অর্জন করতে না পারায় মুখ্যমন্ত্রীর আরো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ''কমিশন বাড়ি গাড়ি নিয়ে বসে আছে। কিন্তু বারবার এক্সিকিউটিভদের (পুলিশ ও প্রশাসনের অফিসারদের) ডেকে পাঠাচ্ছে, দিনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টা বসিয়ে রাখছে। এভাবে চললে তাঁরা কাজ করবে কী করে? যারা এসব করছে তাঁদের নিজেদের দায়বদ্ধতা আছে?'' পরে রাজ্য সরকার চেয়ারম্যান পদে প্রথম বার একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারকে বসায়। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে এই কমিশনের কোনও কার্যকারিতাই ছিল না।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগকে প্রথম দিন থেকেই বন্ধ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন। গণতন্ত্র ধ্বংস করার সব চক্রান্ত মমতা ব্যানার্জি করেছেন। একচ্ছত্র শাসনের পিছনে আছে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষণ করা এবং প্রধানত দেদার লুঠ নিশ্চিত করা এর একটি কারন। দ্বিতীয় কারন – গণতন্ত্রে বিশ্বাসই করেন না মমতা ব্যানার্জি। দলের ভিতরেও তাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য গণতান্ত্রিক কাঠামো। যার অঙ্গ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, মানুষের অংশগ্রহণের পঞ্চায়েত, পৌরসভা। টাকা খরচ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা – মানুষের মতামতই অগ্রাধিকার ছিল বামফ্রন্টের সময়কালে। রাজ্যের পঞ্চায়েত, পৌরসভা হয়েছিল দেশে মডেল। আবার বিরোধীরাও জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা পরিচালনা করেছে অনায়াসে বামফ্রন্টের সময়কালে। তখন তারা কোনদিন বঞ্চনার অভিযোগ করতে পারেনি। সরকারি কর্মচারী থেকে সমাজের যে কোনও পর্যায়ে আন্দোলনের অধিকার ছিল সহজাত। কর্মচারীদের চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে 'ডাইস নন' প্রয়োগ শুরু হয়েছে মমতা-শাসনে। আন্দোলন করলে দূরে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে

রীতি – তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে। আন্দোলনরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা, আন্দীলনরত ছাত্রদের লাঠিপেটা করা এই সময়ের নিদারুণ অত্যাচারের নির্দশন।

অগ্রগতি গণতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। দুর্নীতি, লুঠ আটকানো থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করা – নির্ভর করছে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর। উত্তর প্রদেশসহ বিজেপি পরিচালিত রাজ্যগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে কী দুর্বিষহ অবস্থা সেখানে প্রতিবাদীদের, বিরোধীদের। বিরোধিতা সহ্যই করে না বিজেপিও, সমালোচকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিজেপি'র পথও এক এবং মারাত্মক। কোনও সমালোচনা, বিরোধিতা তারা সহ্য করে না। নয়াদিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে যাঁরা অবস্থান নিয়েছেন, তাঁদের টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো – এটি একটি উদাহরণ। তাদের আছে 'ট্রোল ব্রিগেড।' অর্থাৎ ফেসবুক, টুইটারসহ সোসোল মিডিয়ায় বিজেপি, সঙ্ঘ পরিবার কিংবা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই জঘন্য ভাষায় আক্রমন করে বিজেপি'র কর্মীরা, আরএসএস'র বাহিনী। সমালোচক মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। শাহীনবাগে চলছিল সিএএ বিরোধী আন্দোলন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর স্বয়ং স্লোগান দিলেন,'দেশ কো গদ্দারও কো/ গোলি মারো শালো কো।' ২০২০'র ফেব্রুয়ারিতে শাহীনবাগের আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালো প্রবল হিন্দুত্ববাদী কপিল গুজ্জর। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাজকর্মী, শিল্পীদের স্বাধীন মতপ্রকাশের কোনও সুযোগ বিজেপি রেয়াত করে না। একই পথ তৃণমূল কংগ্রেসের – সবাইকে বশংবদ হতে হবে। নাহলেই হেনস্থার শিকার হতে হবে। এক নিদারুণ দাসত্বের পরিবেশ কায়েম করতে চায় দুটি শক্তিই।

তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি'কে পরাস্ত করাই এক মাত্র দায়িত্ব এই সময়ে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সুখেন্দু পাণিগ্রাহী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।
মূল্য : ৫ টাকা